স্মৃতির রেখা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

SMRITIR REKHA
A Memoir
By Bibutibhusan Bandopadhyay

First Punascha Edition
September, 2026

ISBN 978-81-7332-891-6

Price ₹ 295

প্রথম পুনশ্চ সংস্করণ
সেপ্টেম্বর, ২০২৬

প্রচ্ছদ
আর্ট ক্রিয়েশন

দাম ₹ ২৯৫

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০
থেকে সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস
রোড,কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত। ফোন-৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের
অমর আত্মার উদ্দেশে—

স্মৃতির রেখা
ব্যক্তিগত অনুভূতিমালার টুকরো ইতিহাস

‘শনিবারের চিঠি’র (অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ) সম্পাদকীয় কলমে সদ্য-প্রয়াত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সজনীকান্ত দাস লিখেছিলেন, ‘‘এক বিচিত্র ধরনের দিনলিপি তিনি লিখিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ইহা ঠিক ‘সাহিত্য সেবকের ডায়েরি’ নয়; বাংলাদেশে এই জাতীয় ডায়েরি কেহ লেখেন নাই। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রের সঙ্গে ইহার কিছুটা মিল আছে।’’ বিভূতিভূষণের দিনলিপি-চর্চা সম্পর্কে এ কথাও বলা হয়ে থাকে যে, রবীন্দ্রনাথ ও আন্দ্রে জিদ ছাড়া এমন একনিষ্ঠ ডায়েরি লেখক বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ।

বিভূতিভূষণের প্রথম প্রকাশিত দিনলিপি ‘স্মৃতির রেখা’(১৯৪১)। এটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। জীবনের এক ক্রান্তিকালে নিতান্তই জীবিকার তাড়নায় বিহারে ভাগলপুর-পূর্ণিয়ার জঙ্গলমহালে তাঁর বছর কয়েকের প্রবাসজীবন। ছিলেন পাথুরিয়াঘাটায় সিদ্ধেশ্বর ঘোষের পরিবারে তিরিশ টাকা বেতনের গৃহশিক্ষক। অতঃপর ঘোষদের জমিদারি সেরেস্তার কর্মচারী হিসেবে মাসে চল্লিশ টাকা। উপার্জন বাড়ানোর তাগিদে ভাগলপুরের জঙ্গলমহালে সহকারী ম্যানেজারের পদে যখন যোগ দিলেন, তখন তাঁর বেতন বেড়ে দাঁড়াল পঞ্চাশ টাকা। সেই প্রবাসে এই আর্থিক হিসেবনিকেশের আড়ালে ব্যক্তিগত চেতনার জগতে, জীবনদর্শনের ব্যাপ্তিতে তাঁর যে পারমার্থিক অর্জন, তার অমূল্য নির্যাস এই অনন্য দিনলিপি। সেই কয়েক বছরের অরণ্যযাপনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও অনুভবের আধারে বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে বিভূতিভূষণ আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন নিজেকে, নিজের অন্তর্লোককে আর চারপাশে ছড়িয়ে থাকা জীবনকে। এই অরণ্য-অভিজ্ঞান বিভূতিভূষণের জীবনের দিশারি হয়ে উঠেছিল কোন মন্ত্রে, তার প্রতিটি অণু-চিহ্ন অমোঘ আখরে আঁকা রয়েছে প্রতিটি দিনের যাপনচিত্রে।

কেন বিভূতিভূষণ দিনলিপি লিখতেন? তার জবাবদিহিও তিনি নিজের জবানিতেই রেখে গেছেন। তবে তার সন্ধান এখানে পাওয়া যাবে না। ‘স্মৃতির রেখা’র পরবর্তী যে দিনলিপি তিনি লিখেছিলেন, সেটি ‘তৃণাঙ্কুর’ (১৯২৯-১৯৩৫)। তবে জনতার দরবারে ব্যক্তিগত অনুভূতির স্রোতকে ভিড়িয়ে দেওয়ার

কোনও অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। ওই দিনলিপির ভূমিকায় অতীব আন্তরিক ও হৃদয়গ্রাহী ভাষ্যে তাঁর দিনলিপি লেখার উদ্দেশ্যটি তিনি ব্যক্ত করেছেন। সেটি এরকম:

''আমার জীবনে ব্যক্তিগত অনুভূতির অতীত ইতিহাসের দিক হইতে ইহার মূল্য আমার নিজের কাছে যথেষ্ট বেশি। বহু হারানো দিনের মনের ভাব ও বিস্মৃত অনুভূতিরাজি আবার স্পষ্ট হইয়া উঠে। যে সব অবস্থার মধ্যে কখনও পড়িব না, ক্ষণকালের জন্য তাহার মধ্যে আবার ডুবিয়া যাই এগুলি পড়িতে পড়িতে— ব্যক্তিগত সুখদুঃখকে বাণীমূর্তি দেওয়া ইহার একটি বড়ো সার্থকতা বলিয়া মনে করি।''

'স্মৃতির রেখা'র উন্মোচন—পর্বটি অনন্ত কালপ্রবাহের আড়ালে যে চৈতন্যের নিয়ত উপস্থিতি তার উদ্দেশে এক স্বগত সম্ভাষণ। সময়ের এই মহাসমুদ্রকে সাক্ষী রেখে নশ্বর মানবের চলাচল, তার ক্রমাগত আসা-যাওয়ার অন্তহীন প্রক্রিয়া। ব্যক্তিমানুষের এই জীবনচক্রে 'উচ্চ জীবনানন্দের' সন্ধানই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। ব্যক্তির যাপনের মুহূর্ত-কণাগুলি সেই লক্ষ্যপথে তাকে কর্ম ও চেতনায় কতদূর এগিয়ে দেয় তারই জরিপ করে চলেন তিনি তাঁর দিনলিপির পরবর্তী প্রতিটি পৃষ্ঠায়।

একদিকে আরণ্য–নির্জনতা, অপরদিকে হতদরিদ্র বনবাসী মানুষের জীবন ও জীবিকার অদম্য লড়াই। এ দুয়ের মাঝখানে এক শহুরে আগন্তুকের কর্মব্যস্ততা ও আত্মানুসন্ধান—এই দ্বিমুখী অভিযাত্রা। সেই উপলব্ধি থেকেই তাঁর স্বগতোক্তি: ''এখানকার এক একটা দিন এক-একটা সম্পদ হয়ে উঠছে—কলকাতায় এরকম দিন ক'টা আসে?'' এই আত্মিক বৈভব দিনলিপিকারের মনের গভীরে সৃষ্টি করে এক ভিন্নতর দাবি: ''আরও সূক্ষ্ম আরও তুচ্ছ জিনিসের ইতিহাস চাই; আজকার তুচ্ছতা হাজার বছর পরের মহাসম্পদ। মানুষ মানুষের বুকের কথা শুনতে চায়। কোটি কোটি মানুষ প্রলয়স্রোতে ভাসছে, ভবিষ্যতের সত্যিকার ইতিহাস হবে এই কাহিনী, মানুষের মনের ইতিহাস, তার প্রাণের ইতিহাস।''

সেই 'খাঁটি ইতিহাস' বিভূতিভূষণ আবিষ্কার করেন জঙ্গলমহালের অন্দরে যুগ যুগ ধরে যাপিত জীবনের পটভূমিতে। তাঁর অভিজ্ঞতায় উঠে আসা যে দারিদ্র্যক্লিষ্ট, ভাগ্যবিড়ম্বিত অরণ্যবাসী সমাজ, তাদের অকিঞ্চিৎকর অস্তিত্বের মধ্যেই তিনি খুঁজে পান সেই ইতিহাসের আখ্যান। সেই আবিষ্কারের তাড়না থেকেই তিনি নিজের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হন, ''এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো— একটা কঠিন শৌর্যপূর্ণ গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি। এই বন, নির্জনতা, ঘোড়ায় চড়া, পথ হারানো—অন্ধকার—এই নির্জনে জঙ্গলের মধ্যে খুপড়ী বেঁধে থাকা... এদেশের লোকের দারিদ্র্য, সরলতা, এই virile active life, এই সন্ধ্যায় অন্ধকারে ভরা গভীর বন, ঝাউবনের ছবি।''

সেই জীবনের গতিময়তা প্রায় মহাকাব্যিক আঙ্গিকে উঠে এসেছে 'আরণ্যক' উপন্যাসের চরিত্রদের মিছিলে। ধাতুরিয়া, কুন্তা, মঞ্চি, ধাওতাল সাহু, রাজু পাঁড়েদের

তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবনচরিতকে আশ্রয় করে। এই উপন্যাসের 'প্রস্তাবনা'য় রয়েছে তাঁর সেই অঙ্গীকারের ভণিতাবিহীন ঘোষণা: ''ইহাদের কথাই বলিব। জগতের যে পথে সভ্য মানুষের চলাচল কম, কত অদ্ভুত জীবনধারার স্রোত আপনমনে উপলবিকীর্ণ অজানা নদীখাত দিয়া ঝিরঝির করিয়া বহিয়া চলে সে পথে সে পথে, তাহাদের সহিত পরিচয়ের স্মৃতি আজও ভুলিতে পারি নাই।'' পারেননি বলেই সেই স্মৃতির রেখা ধরে তাঁর পিছুহাঁটা। সেই যাত্রাপথের সঙ্গী দিনলিপিকারের রোমান্টিক অবলোকন স্পৃহাও।

কিন্তু 'স্মৃতির রেখা' কি শুধুই 'আরণ্যক' উপন্যাসের আকর? নিশ্চয়ই নয়। বিভূতিভূষণের এই প্রথম দিনলিপির সঙ্গে অবধারিতভাবেই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে 'পথের পাঁচালীর'ও গভীর, আবেগমথিত অনুষঙ্গ। মায়ের কথা, দিদির কথা, শৈশবের স্মৃতিকথার অনাবিল স্রোত বয়ে চলে অবিরত। ভুলে যাওয়ার উপায় নেই, তখন চলছে 'পথের পাঁচালী'র নির্মাণ পর্ব। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে তাঁর প্রথম উপন্যাস। বিভূতিভূষণের জীবনে সে এক উন্মাদনার পর্যায়। সেই আবেশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে তিনি একেবারেই অনিচ্ছুক। তার স্বীকারোক্তিও রয়েছে দিনলিপির পাতাতেই: ''নভেলে শৈশবকালের স্মৃতিরই পুনরাবৃত্তি করছি মাত্র—কারণ মনের অভিজ্ঞতা, জীবনের অভিজ্ঞতা ছাড়িয়ে কোনো লেখকই যেতে পারেন না—গেলেই সেটা কৃত্রিম, tour de force হয়ে পড়বে।''

'স্মৃতির রেখা' দিনলিপিতে একদিকে যেমন গভীর ছায়া ফেলছে তাঁর শৈশব-স্মৃতি জড়িত প্রথম উপন্যাস, অপরদিকে তেমনি তাঁর স্মৃতিতে জারিত হচ্ছে ইসমাইলপুর-আজমাবাদ-পূর্ণিয়ায় জঙ্গল জীবনের রূঢ় ও রোমান্টিক অভিজ্ঞতা। একই সঙ্গে সেই নির্জন অরণ্য জগতেই আবার ফুলকিয়া বইহারের কলবলিয়া নদীতে স্নান করতে গিয়ে তাঁর মাথায় আসে ইছামতী নদীর কথা। সেই সুবাদে 'ইছামতী' নিয়ে উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা, যার সঙ্গে জড়িয়ে যায় শৈশব থেকে আরও পেছনে নিজের জন্মের পূর্বেকার কথাও। এভাবে ব্যক্তিগত স্মৃতি-আধারিত কত আখ্যানকে যে 'স্মৃতির রেখা' সযত্নে ধারণ করে রাখে তার ইয়ত্তা নেই। এছাড়া অজস্র গল্পের শেকড়ও গাঁথা রয়েছে এই দিনলিপিতে, কিছু উল্লেখ রয়েছে, কিছু বা নেই।

'স্মৃতির রেখা'য় একাধিকবার বিভূতিভূষণ স্মরণ করেছেন উপনিষদ এবং অতীন্দ্রিয়বাদী মার্কিন দার্শনিক রাল্ফ ওয়াল্ডো এমারসনকে। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অন্তরালে থাকা অসীম রহস্যময় অনন্তে এক শাশ্বত চৈতন্যকে তিনি অনুভব করেন প্রকৃতির সর্বব্যাপী প্রসারিত জগতের পরতে পরতে। 'অন্ধকার প্রহরের শেষ রাত্রের চাঁদ—তার পার্শ্ববর্তী শুকতারার পেছনে' বিরাজমান সেই মহিমময় শক্তির উদ্দেশে দিনলিপির সূচনাতেই রয়েছে উপাসকের ভক্তিবিনম্র প্রণতি। সেই শক্তি বিভূতিভূষণের চৈতন্যে আবির্ভূত হয় বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন অবতারে।

‘স্মৃতির রেখা’য় তিনি তাকে স্বপ্ন দেখেন যুগান্তের পর্বতশিখরে নীরব চিন্তামগ্ন তরুণ দেবতার রূপে। ‘পথের পাঁচালী’তে তিনি অপুর জীবনের দিক-নির্দেশক ‘পথের দেবতা’। আবার ‘আরণ্যক’ উপন্যাসে তিনিই সেই বুনোমহিষের দেবতা ‘টাঁড়বরো’, যাঁর কাছে অনুতপ্ত সত্যচরণ ক্ষমাভিক্ষায় নতজানু।

কবি পাবলো নেরুদার ‘স্মৃতিকথা’র প্রথম অধ্যায় ‘দ্য চিলিয়ান ফরেস্ট’। সেখানে রয়েছে চিলির গভীর অরণ্যের সুষমাময় ছবি। তিনি লিখেছেন, ‘‘একটা শেয়াল নৈঃশব্দ্য ভেঙে এক ঝলক বিদ্যুতের মতো শুকনো পাতায় কাঁপন ধরিয়ে ছুটে গেল। কিন্তু নিস্তব্ধতাই উদ্ভিদ জগতের দস্তুর... দূরে কোনও হতবুদ্ধি প্রাণীর অস্ফুট চিৎকার... কোটরে লুকিয়ে থাকা কোনও পাখির তীক্ষ্ণ ডাক... উদ্ভিজ্জের মৃদু আওয়াজ শোনা যায় যতক্ষণ না ঝড় এসে মাটির গানের তুফান তোলে। চিলির এই অরণ্য যারা কোনওদিন চাক্ষুষ করেনি, পৃথিবী নামে এই বিপুলাকৃতি গ্রহের কিছুই তাদের জানা নেই।’’ সেই চিত্রণ তিনি সমাপ্ত করেন এই উচ্চারণে: I have come out of that landscape, that mud, that silence, to roam, to go singing through the world. তবে সেখানে মানুষের কথা নেই। এই ‘স্মৃতিকথা’র প্রায় চার দশক আগে এই গ্রহেরই অপর প্রান্তে স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল আরএক অরণ্যের অন্তর্লীন জীবন সংগীত। কিন্তু সেই অরণ্যকে ঘিরে নেরুদার মতো কোনও অহংবোধের উচ্চারণ নেই। থাকার কথাও নয়। কারণ ‘স্মৃতির রেখা’র সমাপ্তিতে জঙ্গলমহাল ছেড়ে আসার সময় রয়েছে তাঁর অকপট নম্র নিবেদন: ‘‘এসব egotism ছেড়ে এলাম।’’ সেই উচ্চারণ বুঝি এক অর্থে উত্তরসূরির উদ্দেশেই নিবেদিত। অরণ্যের কাছে যেতে হয় মুক্তমনের অধিকারী হতে—এই অমোঘ সত্যে তিনি চিরবিশ্বাসী। দিনলিপিতে জঙ্গলের সবুজ আখরে আঁকা সেই আরণ্য-অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছিল প্রকৃত অর্থেই বিভূতিভূষণের জীবনের দিক্‌নির্দেশ। তার তাল ও ছন্দ হয়তো নেরুদার সমধর্মী, তবে নিঃসন্দেহে আরও গভীর ব্যঞ্জনাময়।

কলকাতা ৭০০১৫৭ চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল

কাল তোমাকে দেখতে পেয়েছি। শেষরাত্রের কাটা চাঁদের ও শুকতারার পেছনে তুমি ছিলে। এই শেষ রাতের আকাশের পেছনে, এই ফুল ফোটা নিমগাছের ডালের সঙ্গে, এই সুন্দর শান্ত ঘন নীল আকাশে এক হয়ে কেমন করে তুমি জড়িয়ে আছ। কত প্রাণী, কত গাছপালার বংশ তৈরী হ'ল, আবার চলে গেল—ঐ যে পায়রাদল উড়ছে, ঐ যে নারকেল গাছটার মাথা ভোরের বাতাসে কাঁপছে, ঐ যে বন-মূলোর ঝাড় ছাদের আলসেতে জন্মেছে, আমার ছাত্র বিভূতি—দু'হাজার বছর আগে এরা সব কোথায় ছিল? দু'হাজার বছর পরেই বা কোথায় থাকবে? এদের সমস্ত ছোটখাটো সুখদুঃখ আনন্দহতাশা নিয়ে ছোট্ট বুদ্বুদের মত অনন্ত গহন গভীর কালসমুদ্রে কোথায় মিলিয়ে যাবে, তার ঠিকানাও মিলবে না—আবার নতুন লোকজন ছেলেপিলে আসবে, আবার নতুন ফুলফলের দল আসবে, আবার নতুন সব সুখদৈন্য হর্ষহতাশা আসবে, কত মিষ্টি জ্যোৎস্নারাত্রির মাধবী বাতাস আবার বইবে, পুরোনো উজ্জয়িনীর কেশধূপবাস যেমন মদির ছিল, ভবিষ্যৎ কোন বিলাস-উজ্জয়িনীতে নতুন কেশরাশি পুরোনো দিনের চেয়ে কিছু কম মদির হয়ে উঠবে না, কত গ্রাম্য-নদী ভবিষ্যতের অনাগত গ্রাম-বধূদের সুখদুঃখ সম্ভার নিয়ে বয়ে চলবে...আবার তারা যাবে, আবার নতুন দল আসবে।

কিন্তু তুমি ঠিক আছ। হে অনন্ত, যুগে যুগে তুমি কখনো বদলে যাও না। সমস্ত পরিবর্ত্তন বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে, সমস্ত ধ্বংস-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অপরিবর্ত্তিত, অনাহত তুমি যুগ থেকে যুগান্তরে চলেছ। এই দৃশ্যমান পৃথিবী যখন আকাশে জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড ছিল, তারও কত অনন্তকাল পূর্ব্ব থেকে তুমি আছ, এই পৃথিবী যখন আবার কোন দূর অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতে, যখন আবার জড় পদার্থের টুকরোতে রূপান্তরিত হয়ে দিকহারা উল্কার গতিতে উদভ্রান্ত হয়ে অনন্ত ব্যোমে ছোটাছুটি করবে, তখনও তুমি থাকবে। কালের অতীত, সীমার অতীত, জ্ঞানের অতীত কে তুমি—তোমাকে চেনা যায় না। অথচ মনে হয়, এই যেন বুঝলাম, এই যেন চিনলাম! শেষ রাত্রের নদীর জলে যখন চিকচিকে মিষ্টি জ্যোৎস্না পড়ে, শেওলায় কূলে তাল দেয়, তখন মনে হয় সেখানে তুমি আছ, ছোট্ট ছেলে তার কচি মুখ নিয়ে ভুরভুরে কচিগন্ধ সমস্ত গায়ে মেখে যখন